بسم الله الرحمن الرحيم

জার্মানীর গিসেন-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ অক্টোবর, ২০১৯ মোতাবেক ১৮ ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীদের ধারাবাহিক যে স্মৃতিচারণ চলছে আজও তা অব্যাহত থাকবে। বিগত দিনগুলোতে সফর ও বিভিন্ন জলসার কারণে এই স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাহাবীদের স্মৃতিচারণমূলক সর্বশেষ যে খুতবা আমি দিয়েছিলাম তা ছিল ২০ সেপ্টেম্বরের খুতবা। সেই খুতবায় হযরত খুবায়েব বিন আদী-র স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল এবং তার কিছু অংশ বর্ণনা করা বাকি ছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তিনি শাহাদত বরণের সময় আল্লাহ্ তা'লাকে বলেছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। যাহোক এরা অতি উন্নত মর্যাদার মানুষ ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক ছিলেন। আর তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কেমন ছিল তা-ও একথা থেকে জানা যায় যে, যখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! এখানে আর কোন উপায় নেই, তুমিই আমার সালাম মহানবী (সা.)-কে পৌঁছে দাও; তখন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে তার সালাম পৌঁছে দিয়েছেন। বৈঠকে বসা অবস্থায় মহানবী (সা.) ওয়া আলাইকুমুস্ সালামও বলেছেন এবং উপস্থিত সাহাবীদের কাছে তার উল্লেখ করে এটিও বলেছেন যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন।

হযরত খুবায়েব বিন আদী এবং তার সঙ্গীসাথিদের শাহাদত বরণের পর মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন উমাইয়াকে নির্দেশ দেন যে, মক্কায় যাও আর এই নির্যাতনের হর্তাকর্তা আবু সুফিয়ানকে হত্যা কর; এটিই তার শাস্তি। তিনি (সা.) তার সাথে হযরত জাব্বার বিন সাখার আনসারী (রা.)-কেও প্রেরণ করেন। এরা উভয়ে মক্কা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত ইয়াজেজ উপত্যকার এক ঘাটিতে নিজেদের উট বেঁধে রাতের অন্ধকারে মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত জাব্বার হযরত আমরকে বলেন, হায়! আমরা যদি কাবার তাওয়াফ করতে পারতাম আর (কাবা চত্বরে) দু'রাকাত নামায আদায় করতে পারতাম। তখন হযরত আমর (রা.) বলেন, কুরাইশদের রীতি হলো, তারা রাতের খাবার খেয়ে নিজেদের আঙিনায় বসে পড়ে, তাই আমরা আবার ধরা না পড়ি! হযরত জাব্বার (রা.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ এমনটি কখনো হবে না। হযরত আমর (রা.) বলেন, এরপর আমরা কাবা-র তাওয়াফ করি এবং দু'রাকাত নামায আদায় করি। অতঃপর আমরা আবু সুফিয়ানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন মক্কার জনৈক ব্যক্তি আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং আমাকে চিনতে পেরে বলে উঠে, এ যে আমর বিন উমাইয়া, নিশ্চয় কোন অপকর্মের উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাকবে। এতে আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, প্রাণ রক্ষা করো, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। অতঃপর আমরা দ্রুত সেখান থেকে চলে যাই, অবশেষে একটি পাহাড়ে চড়ে আশ্রয় নেই। তারাও আমাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আমরা যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে যাই তখন তারা হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এরপর আমরা নিচে নেমে পাহাড়ের একটি গুহায় ঢুকে পড়ি এবং পাথর একত্র করে উপরে ও নিচে

বিছিয়ে দেই আর সেখানেই আমরা রাত অতিবাহিত করি। সকালে জনৈক কুরায়শী তার ঘোড়া নিয়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমরা পুনরায় গুহায় আত্মগোপন করি। আমি বললাম, এই ব্যক্তি যদি আমাদেরকে দেখে থাকে তাহলে সে হৈচৈ করবে, তাই তাকে ধরে হত্যা করাই শ্রেয়। হযরত আমর বর্ণনা করেন, আমার কাছে একটি খঞ্জর ছিল যা আমি আবু সুফিয়ানের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। আমি সেই খঞ্জর দিয়ে উক্ত ব্যক্তির বুকে আঘাত করি, এতে সে এত উচ্চস্বরে চিৎকার করে যে, মক্কাবাসীরা তার চিৎকার শুনতে পায়। তিনি বলেন, আমি পুনরায় স্বস্থলে এসে লুকিয়ে পড়ি। মানুষ যখন দ্রুত তার কাছে পৌঁছে তখন সে অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার ওপর কে হামলা করেছে? উত্তরে সে বলে, আমর বিন উমাইয়া। এরপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে আর সে সেখানেই মারা যায় এবং তাদেরকে আমাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে অবগত করতে পারে নি। সে যুগে অবস্থা এরূপই ছিল যে, শত্রুরা জানতে পারলে পরস্পরের প্রতি ঘোরতর শত্রুতার কারণে এটিই বলা হতো যে, হত্যা কর। তাদের সন্দেহ হয়েছিল যে, যেহেতু সে আমাদেরকে দেখে ফেলেছে, অতএব এখন সে ফিরে গিয়ে বলে দিবে এবং এরপর কাফেররা আমাদের পশ্চাদ্ধাবনে আসবে আর আমাদেরও হত্যা করবে। সুতরাং এমনটি ঘটার পূর্বেই আত্মরক্ষার্থে তারা এরূপ করেন। যাহোক তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সে মক্কাবাসীদের অবহিত করতে পারেনি, তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় আমি নিজ সাথিকে বললাম যে, এখন আমরা নিরাপদ। অতএব আমরা রাতে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমরা একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যারা হযরত খুবায়েব বিন আদী-র মরদেহ পাহারা দিচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হযরত আমরকে দেখে বলে যে, খোদার কসম, এই ব্যক্তির হাঁটাচলার ভঙ্গি যতটা আমর বিন উমাইয়ার হাঁটাচলার সাথে সাদৃশ্য রাখে এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্য (দুব্যক্তির চলার ভঙ্গিতে) আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। যদি সে মদিনায় না হতো তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতাম যে, এ-ই আমর বিন উমাইয়া। এখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের চোখে পর্দা দিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত জাব্বার যখন সেই কাঠ পর্যন্ত পৌঁছেন যাতে হযরত খুবায়েবকে ঝুলানো হয়েছিল, তখন দ্রুত সেটিকে উঠিয়ে যাত্রা করেন। তারাও তার পিছু ধাওয়া করে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মদের নেশায় বিভোর ছিল, নেশাগ্রস্ত ছিল, কেউ সজাগ, কেউ ঘুমন্ত আর কেউ ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। যাহোক তারা টের পায় নি আর তিনি দ্রুত তা নিয়ে ছুটেন। এরপর তারা যখন টের পায় তখন তারাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, এমনকি হযরত জাব্বার যখন ইয়াজেজ পাহাড়ের বন্যার পানিসৃষ্ট নর্দমার কাছে পৌঁছেন তখন তিনি সেই কাষ্ঠদণ্ড উক্ত নর্দমায় নিক্ষেপ করেন। তারাও পিছন পিছন এসে উপস্থিত হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই কাষ্ঠদণ্ড উক্ত কাফেরদের চোখে অদৃশ্য করে দেন ফলে তারা সেটি খুঁজে পায় নি। হযরত আমর বর্ণনা করেন যে, আমি আমার সাথি অর্থাৎ হযরত জাব্বারকে বললাম যে, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে পড় আর নিজ উটে বসে যাত্রা কর, আমি তাদেরকে তোমার পশ্চাদ্ধাবন হতে বিরত রাখব। হযরত আমর বর্ণনা করেন, এরপর আমি যাত্রা করি এবং ইয়াজনান পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাই যা মক্কা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করি। সেখান থেকে বেরিয়ে 'আরজ' নামক স্থানে পৌঁছি যা মদিনা থেকে ৭৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এরপর অগ্রসর হতে থাকি। তিনি বলেন, যখন আমি 'নাকি' নামক স্থানে আসি, যা মদিনা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত, তখন মুশরেক কুরাইশদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তিকে দেখতে পাই যাদেরকে কুরাইশরা মদিনায়

গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রেরণ করেছিল। আমি তাদেরকে বললাম, অস্ত্রসমর্পণ কর কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য এসেছ। কিন্তু তারা আত্মসমর্পন করে নি, ফলে লড়াই আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, একজনকে আমি তির ছুড়ে হত্যা করি আর অপরজনকে বন্দি করি এবং বেঁধে মদিনায় নিয়ে আসি।

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে গুপ্তচর হিসেবে একা পাঠিয়েছিলেন যেন হযরত খুবায়েবকে কাষ্ঠদণ্ড থেকে নামাতে পারেন। তিনি বলেন, রাত্রিকালে আমি হযরত খুবায়েবের কাষ্ঠদণ্ডের কাছে পৌঁছে তাতে আরোহন করি। আশঙ্কা ছিল যে, কেউ আমাকে দেখে না ফেলে। যখন আমি সেই কাষ্ঠদণ্ড ছেড়ে দেই তখন তা মাটিতে পড়ে যায়। অতঃপর আমি দেখি যে, সেই কাষ্ঠখণ্ড এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় যেন ভূমি তা গ্রাস করে ফেলেছে। সেই দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত হযরত খুবায়েবের অস্থির কোন উল্লেখ নেই।

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী বর্ণনা করেন, হযরত খুবায়েবকে রশি ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে নিচে শোয়ানোর সময় আমি আমার পিছনে কারো পদধ্বনি শুনতে পাই। এরপর যখন আমি পুনরায় সোজা হই তখন কিছুই দেখতে পাই নি এবং হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম রেওয়ায়েত অধিক সঠিক মনে হয় যে, অর্থাৎ তারা পিছু ধাওয়া করলে তিনি [হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশ] নদীতে ফেলে দেন আর নদী তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা যেহেতু নদীর পানিতে স্রোত ছিল তাই তা লাশকে নীচের দিকে বয়ে নিয়ে যায়। যাহোক এ সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যাহোক তিনি এভাবে খ্যাতি লাভ করেন যে, তাঁর লাশ মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কাফেররা তা খুঁজে বের করতে পারে নি আর তাঁর লাশের সাথে অসম্মানজনক যা কিছু করতে চেয়েছিল তা তারা করতে পারে নি এবং আল্লাহ্ তা'লা তা সুরক্ষিত রেখেছেন।

হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.)-এর বন্দিদশার ঘটনা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এটিও রয়েছে যে, মাবিয়া ছিলেন হুজায়ের বিন আবু ইহাবের মুক্ত দাসী। মক্কায় তার ঘরেই হযরত খুবায়েব (রা.) বন্দি ছিলেন যাতে পবিত্র মাস সমূহ শেষ হলে তাকে হত্যা করা যায়। মাবিয়া পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং খুবই ভালো মুসলমান প্রমাণিত হন। পরবর্তীতে মাবিয়া এ ঘটনা শুনাতেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি হযরত খুবায়েবের চেয়ে ভালো কোন (বন্দি) দেখি নি। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি তাঁকে দেখতাম, তিনি শিকলাবদ্ধ ছিলেন। আমার জানামতে পৃথিবীর বুকে খাওয়ার জন্য তখন একটি আঙুরও ছিল না, অর্থাৎ সেই অঞ্চলে কোন আঙুর ছিল না, কিন্তু হযরত খুবায়েব (রা.)-এর হাতে মানুষের মাথার সমান আঙুরের থোকা থাকত অর্থাৎ অনেক বড় থোকা থাকত যা থেকে তিনি খেতেন। তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিয্‌ক ছাড়া আর কিছু ছিল না। হযরত খুবায়েব (রা.) তাহাজ্জুদের নামাযে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং মহিলারা তা শুনে কেঁদে ফেলত আর হযরত খুবায়েব (রা.)-এর প্রতি তাদের দয়া হতো। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত খুবায়েব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, হে খুবায়েব! আপনার কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে হ্যাঁ, একটি জিনিস প্রয়োজন, আমাকে ঠান্ডা পানি পান করাও আর প্রতিমার নামে জবাই করা পশুর মাংস আমাকে দিবে না। অর্থাৎ তোমরা আমাকে যে খাবার দিয়ে থাক তাতে সেই খাবার অন্তর্ভুক্ত করো না যা প্রতিমার নামে জবাই করা হয়েছে। আর তৃতীয়

বিষয় হলো মানুষ যখন আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিবে তখন তুমি আমাকে বলে দিও। পবিত্র মাস শেষ হওয়ার পর মানুষ যখন হযরত খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করার বিষয়ে একমত হয় তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এ সংবাদ প্রদান করি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তাঁর হত্যার কোনো পরোয়া করেন নি। তিনি আমাকে বলেন, আমার কাছে একটি ক্ষুর পাঠিয়ে দাও যাতে আমি নিজেকে পরিপাটি করে নিতে পারি। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলে আবু হোসেনের হাতে ক্ষুর পাঠিয়ে দেই। এই পুত্র তার আপন ছেলে ছিল না বরং মাবিয়া তার প্রতিপালন করেছিলেন মাত্র– এটিই লিখা আছে। তিনি বলেন, শিশু ছেলেটি তাঁর কাছে চলে যাওয়ার পর আমার মনে এই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ্‌র কসম! খুবায়েব এখন তাঁর প্রতিশোধের সুযোগ পেয়ে গেছে। আমার ছেলে এখন তাঁর কাছে রয়েছে এবং ক্ষুর তাঁর হাতে। এখন তো সে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, এটি আমি কী করলাম? এই শিশু ছেলের হাতে ক্ষুর পাঠিয়ে দিয়েছি! খুবায়েব এই শিশু ছেলেকে ক্ষুর দিয়ে হত্যা করবে এবং এরপর বলবে পুরুষের বদলে পুরুষ। রেওয়ায়েতে এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, সেই শিশু ছেলেটি খেলতে খেলতে তাঁর কাছে চলে গিয়েছিল আর তাঁর হাতে ক্ষুর ছিল, কিন্তু একটি রেওয়ায়েত এটিও রয়েছে যা বিস্তারিত। অর্থাৎ ছেলেটি ছিল স্বজ্ঞানে এবং সে বয়সের এমন সীমায় ছিল যখন তার হাতে কোন জিনিস পাঠানো যায় আর তা তিনি পাঠিয়েছেন। অতএব তিনি বলেন, সে যাওয়ার পর খুবায়েব বলবেন, ঠিক আছে! তোমরা আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছ তাই আমিও একে হত্যা করছি। আমার ছেলে ক্ষুর নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি তা নেয়ার সময় রসিকতা করে তাকে বলেন, তুমি খুবই সাহসী। তোমার মায়ের কি এই ভয় হয় নি যে, আমি বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারি? সে তোমার হাতে আমার কাছে ক্ষুর পাঠিয়ে দিয়েছে, যখন কিনা তোমরা আমাকে হত্যার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছ! হযরত মাবিয়া বলেন, খুবায়েবের এসব কথা আমি শুনছিলাম। আমি বললাম, হে খুবায়েব! আমি আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিরাপত্তার কারণে তোমাকে ভয় করি নি এবং আমি তোমার খোদার প্রতি ভরসা করে এই শিশুর হাতে তোমার নিকট ক্ষুর পাঠিয়েছি। আমি এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি এটি দিয়ে আমার ছেলেকে হত্যা করবে। হযরত খুবায়েব (রা.) বলেন, আমি এমন প্রকৃতির নই যে, তাকে হত্যা করব। আমরা আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতাকে বৈধ জ্ঞান করি না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি খুবায়েবকে সংবাদ দেই যে, মানুষ আগামীকাল সকালে তোমাকে এখান থেকে বের করে হত্যা করবে। এরপর যা হয়েছে তা হলো- পরের দিন মানুষ তাকে শিকলাবদ্ধ করে 'তানিম' নামক স্থানে নিয়ে যায় যা মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। আর হযরত খুবায়েব-এর হত্যার দৃশ্য দেখার জন্য শিশু, নারী, দাস ও মক্কার বহু লোক সেখানে পৌঁছে এবং এই বর্ণনা অনুযায়ী কেউ তখন মক্কায় ছিল না।

প্রতিশোধ পরায়ণ ব্যক্তিরা, যারা তাদের জ্যেষ্ঠদের যুদ্ধে নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল, নিজেদের চোখের প্রশান্তির জন্য সেখানে গিয়েছিল। আর যাদের প্রতিশোধ নেয়ার ছিল না কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধী ছিল তারা কেবল বিরোধিতা ও আনন্দ করার জন্য সেখানে গিয়েছিল যে, দেখি! কীভাবে তাকে হত্যা করা হয়? অতঃপর খুবায়েব (রা.)-কে যখন যায়েদ বিন দাসেনার সাথে 'তানিম' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মুশরিকদের আদেশে মাটিতে একটি লম্বা খুঁটি গাঁড়া হয়। এরপর মানুষ যখন খুবায়েব (রা.)-কে সেই কাষ্ঠদণ্ডের কাছে নিয়ে যায় তখন খুবায়েব (রা.) বলেন, আমি কি দুই রাকাত নামায

পড়তে পারি? মানুষ বলে, ঠিক আছে। হযরত খুবায়েব (রা.) লম্বা না করে সংক্ষেপে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেন। এটি সেই মহিলার বর্ণনা।

ইবনে সা'দের বরাতে যে রেওয়ায়েত এখন বিবৃত বর্ণিত হলো সে অনুযায়ী হুজায়ের বিন আবু ইহাবের স্বাধীনকৃত দাসী মাবিয়ার ঘরে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার-এর মতে হযরত খুবায়েব (রা.) উকবার ঘরে বন্দি ছিলেন আর উকবার স্ত্রী তাকে খাবার সরবরাহ করতেন এবং খাবারের সময় তিনি হযরত খুবায়েব-এর বাধন খুলে দিতেন। আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী লিখেন, হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম সাহাবী ছিলেন যাকে আল্লাহ্ তা'লার পথে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় অর্থাৎ প্রথমে মাটিতে কাষ্ঠদণ্ড পোঁতা হয় আর এর গায়ে বেঁধে তাকে শহীদ করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ হত্যার ঘটনা সম্পর্কে লিখেন, এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মাঝে মক্কার সর্দার আবু সুফিয়ানও ছিল। সে যায়েদকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এটি পছন্দ কর না যে, মুহাম্মদ (সা.) তোমার স্থানে থাকবে এবং তুমি নিজ ঘরে আরামে বসে থাকবে। যায়েদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তর দেন যে, আবু সুফিয়ান! তুমি কি বলছ? খোদার কসম, মুহাম্মদ (সা.) এর পায়ে মদিনার গলিতে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার চেয়ে আমার জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। এই আত্মনিবেদনের প্রেরণা দেখে আবু সুফিয়ান প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। এই উত্তর এমন ছিল যে, আবু সুফিয়ান এতে প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। আর সে অবাকবিস্ময়ে যায়েদের দিকে তাকায় এবং তৎক্ষণাৎ চাপাস্বরে বলতে থাকে যে, খোদা সাক্ষী, মুহাম্মদ (সা.) এর সাথীরা যেভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসে আমি অন্য কোন ব্যক্তিকে এভাবে কাউকে ভালোবাসতে দেখি নি।

এটি ছিল মহানবী (সা.) এর সাথে তার সাহাবীগণের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক এবং প্রাণ উৎসর্গ করার নমুনা। আর অপর দিকে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কেমন ছিল তা-ও প্রকাশিত হয়েছে। যখন তিনি এ কথা বলেন যে, আমি যেহেতু খোদা তা'লার পথে মৃত্যু বরণ করছি তাই যেদিকেই পতিত হই না কেন তাতে কিছু যায় আসে না যে, ডানে পতিত হই বা বামে পতিত হই অথবা সামনে পতিত হই কিংবা পেছনে পতিত হই, আমি তো খোদার খাতিরে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করছি। একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যার প্রকাশ নিহত হওয়ার পূর্বে তিনি করেছেন, আর তা-ও হলো এই যে, আল্লাহ্‌র সমীপে সিজদা করে নেই, দুই রাকাত নফল পড়ে নেই। মহানবী (সা.)-এর সমীপে সালাম পৌঁছানোর বাসনা ছিল, সেটিও আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করেছেন অর্থাৎ তা পৌঁছিয়ে দেন। আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার চিত্র হলো, এটিও মানতে প্রস্তুত ছিলেন না যে, তাঁর (সা.) পায়ে কোন কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা পাবে। মহানবী (সা.)-এর সামান্যতম কষ্টও তাদের কাছে ছিল অনেক বড় বিষয়, পক্ষান্তরে নিজ জীবনের কোন পরোয়া তারা করতেন না। আর এজন্যই তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল হলেন পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু অউফ শাখার সাথে। তিনি মুনাফেক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল-এর পুত্র ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর একান্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র মাতার নাম ছিল খওলা বিনতে মুনযের। অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র নাম ছিল হুব্বাব, মহানবী (সা.) তার নাম পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ্ রাখেন এবং বলেন হুব্বাব হলো শয়তানের

নাম। মুনাফেক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এর দাদীর নাম ছিল সলুল- যার সম্পর্ক ছিল খুযাআ গোত্রের সাথে। উবাই তার মায়ের দিক থেকে পরিচিত ছিল, তাই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বলা হতো। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল আবু আমের সন্যাসীর খালাতো ভাই ছিল। আবু আমের সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মানুষের কাছে মহানবী (সা.)-এর আগমনের কথা বলত যে, এক নবীর আগমন ঘটতে যাচ্ছে আর সেই নবীর ওপর ঈমান আনার ইচ্ছাও ব্যক্ত করত এবং মানুষের কাছে তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি দিত যে, তাঁর আগমন হতে যাচ্ছে। অজ্ঞতার যুগে আবু আমের 'টাট' পরিধান করতো অর্থাৎ মোটা বস্ত্র পরিধান করত আর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন স্বীয় রসূল (সা.)-কে প্রেরণ করেন তখন সে যে কথার নসীহত করত তার বিপরীত রূপ ধারণ করে এবং বিদ্বেষমূলক আচরণ আরম্ভ করে আর বিদ্রোহ করে, অধিকন্তু নিজ অস্বীকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বদরের যুদ্ধে সে মুশরিকদের পক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার নাম 'ফাসেক' রাখেন। হযরত আব্দুল্লাহ্র সন্তানদের মধ্যে উবাদা, জুলায়হা, খায়সামা, খাওয়াল্লি ও উমামাহ্-র উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি খুব ভালো মুসলমান ছিলেন, তিনি বিখ্যাত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লিখতে-পড়তেও জানতেন। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্র বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ কাতেবে ওহী (ওহী লেখক) হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্র নাক কেটে যায়, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে স্বর্ণের নাক লাগিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু অপর এক বর্ণনামতে উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত আব্দুল্লাহ্র দু'টি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, যার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে স্বর্ণের দাঁত লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দাঁত সংক্রান্ত বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ ও সঠিক। আর এটাই সঠিক বলে মনে হয়। কখনো কখনো কতিপয় বর্ণনাকারী অতিরঞ্জন করে ফেলেন, কিংবা কখনো কখনো সঠিক বিষয়টি ধরতে পারেন না। যাহোক, নাক নয় বরং দাঁতের কথা-ই অধিক সঠিক বলে মনে হয় যে, দাঁত ভেঙে গিয়ে থাকবে যার ফলে মহানবী (সা.) বলেন, স্বর্ণের দাঁত লাগিয়ে নাও; আর সে যুগেও এরকমই করা হতো, ক্রাউন বসিয়ে নেয়া হতো।

উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল যে, পরবর্তী বছর আমরা পুনরায় বদরের প্রান্তরে মিলিত হব। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে 'সীরাত খাতামান্নাবিঈন' পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ঘেঁটে যে ফলাফল বের করেছেন তা হলো–

উহুদের যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরার পথে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আগামী বছর বদরের প্রান্তরে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে আর মহানবী (সা.) সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। তাই পরবর্তী বছর অর্থাৎ চার হিজরী সনের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবার একটি দল সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হলেন এবং তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলকে আমীর নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ যখন তিনি (সা.) সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ্কে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। অপরদিকে আবু সুফিয়ান বিন হারব্-ও কুরায়শের দুই হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু উহুদের

বিজয় এবং এত বড় বাহিনী সাথে থাকা সত্ত্বেও তার হৃদয় ভীত-ত্রস্ত ছিল এবং ইসলামের ধ্বংস চাওয়া সত্ত্বেও সে চাচ্ছিল যতক্ষণ অনেক বড় সেনাদলের ব্যবস্থা না হবে সে মুসলমানদের মুখোমুখি হবে না। সুতরাং সে মক্কায় থাকা অবস্থায়ই নুআয়েম নামের এক ব্যক্তিকে, যে এক নিরপেক্ষ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখত, মদিনা অভিমুখে প্রেরণ করে এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয় যে, যে করেই হোক মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে, হুমকি-ধমকি দিয়ে এবং সত্য-মিথ্যা বলে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং এই ব্যক্তি মদিনায় আসে এবং কুরাইশদের প্রস্তুতি ও শক্তি এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সে মদিনায় একটি অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। এমনকি কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ভয় করতে থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন এবং তিনি (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন যে, আমরা কাফেরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এই যুদ্ধে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছি, তাই আমরা এটি থেকে পিছু হটতে পারব না, এর ব্যত্যয় ঘটবে না। তোমরা ভয় পেলে আমাকে যদি একাও যেতে হয় আমি যাব এবং একাই শত্রুর মোকাবিলা করব। এই কথা শুনে মানুষের ভয় দূর হতে থাকে এবং তারা গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর (সা.) সাথে বের হতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

যাহোক মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন আর অপরদিকে আবু সুফিয়ান তার দুই হাজার সেনাসহ মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু ঐশী পরিকল্পনা যেভাবে প্রকাশিত হয় তাহলো মুসলমানরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠিকই বদরের প্রান্তরে পৌঁছে যায় কিন্তু কুরাইশবাহিনী কিছুদূর এগিয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে যায়। এই ঘটনা যেভাবে ঘটে তা হলো, আবু সুফিয়ান যখন নুআয়েম-এর ব্যর্থতা সম্বন্ধে অবগত হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের ভীতি-প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছিল, (তার মাধ্যমে) যখন জানতে পারে যে, মুসলমানরা ভয় পায় নি বরং তারা বেরিয়ে এসেছে, তখন সে মনে মনে ভয় পায় এবং নিজ সেনাবাহিনীকে এই কথা বলে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যে, এ বছর প্রচণ্ড খরা দেখা দিয়েছে আর সাধারণ মানুষ কষ্টের মাঝে রয়েছে; তাই এখন যুদ্ধ করা উচিত নয়। স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলে আর অবস্থা ঠিক হয়ে গেলে অধিক প্রস্তুতির সাথে আমরা মদিনায় আক্রমণ করব।

যাহোক ইসলামী সেনাদল আট দিন পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে অবস্থান করে। আর সেখানে সেই ময়দানে যেহেতু প্রতি বছর জিলকদ মাসের শুরুতে মেলা বসতো তাই সেই দিনগুলোতে মেলা বসে আর সাহাবীরা এই মেলাতে ব্যবসা করে অনেক লাভ করেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, এই আট দিনের ব্যবসায় অর্থাৎ সেখানে অবস্থানকালে তারা নিজেদের মূলধনকে দ্বিগুণ করে নেন। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব যে পুঁজি ছিল তা সেখানে ব্যবসার কারণে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশ বাহিনী আসে নি তাই মেলার সমাপনান্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদর থেকে যাত্রা করে মদিনায় ফিরে আসেন, আর কুরাইশরা মক্কায় ফিরে গিয়ে পুনরায় মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করে। এটিকে বদরুল মওয়েদের যুদ্ধ বলা হয় যার জন্য এই সেনাদল বের হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ১২ হিজরী সনে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌র পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্বন্ধে রেওয়ায়েত রয়েছে। এসব রেওয়ায়েত ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পর্ক না রাখলেও আমি এজন্য বর্ণনা করি যেন ইতিহাস সম্পর্কেও জানা যায়। হযরত উসামা বিন

যায়েদ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি গাধায় আরোহন করেন যেটার ওপর ফাদাকের তৈরী চাদর বিছানো ছিল এবং তিনি (সা.) হযরত উসামা বিন যায়েদকে নিজের পিছনে বসিয়ে নেন। তিনি (সা.) হযরত সাদ বিন উবাদা (রা.)-এর শুশ্রূষার জন্য যাচ্ছিলেন, যিনি বনু হারেস বিন খাযরাজ-এর পাড়ায় বসবাস করতেন। এটি বদরের যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। হযরত উসামা বলতেন, পথিমধ্যে তিনি (সা.) এমন এক বৈঠক অতিক্রম করেন যাতে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল ছিল, আর এটি সেই সময়কার ঘটনা যখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মুসলমান হয় নি। অর্থাৎ সে যে কপটতামূলক ঈমান আনয়ন করেছিল, সেই সময় তা-ও ছিল না। সেই বৈঠকে কিছু মুশরিকও বসা ছিল, কতক ইহুদিও ছিল, কতিপয় মুসলমানও বসা ছিল, এটি একটি মিশ্র বৈঠক ছিল। উক্ত সভায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। যখন সেই পশুর (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গাধার চলার কারণে সৃষ্ট) ধূলা সেই মজলিসের ওপর পতিত হয় তখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে আর খুবসম্ভব মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করেই বলে যে, ধূলা উড়িও না। মহানবী (সা.) সালাম বলার পর থামেন এবং পশুর বাহন থেকে নামেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আসার জন্য আহ্বান করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনান। আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বলে, হে ব্যক্তি! তুমি যে কথা বলছো তা থেকে উত্তম আর কোন কথা নেই। অর্থাৎ তুমি যা বলছ তা সঠিক, অথবা এ কথার অর্থ এটি ছিল যে, তোমার মতে এর চেয়ে ভালো আর কোন কথা নেই, অথবা এর চেয়ে আর কোন ভালো কথা কি তুমি বলতে পার না? এই বাক্যের বহু অর্থ হতে পারে, যাহোক কীভাবে অনুবাদ করা হয়েছে তা মূল উদ্বৃতি থেকেই জানা সম্ভব। যাহোক সে বলে যে, যদি এটি সত্য হয়ে থাকে অর্থাৎ তুমি যা বলছ তা সত্য হলেও আমাদের সভায় এসে আমাদের কষ্ট দিও না, নিজ জায়গায় ফিরে যাও এবং যে তোমার কাছে আসে তার কাছে বল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এটি শুনে বলেন যে, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের এসব সভায় এসেই আপনি আমাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন। আমরা এটিই পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিরা পরস্পরকে ভালোমন্দ বলতে থাকে। তারা একে অন্যের ওপর আক্রমণ করার দ্বারপ্রান্তে ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের উত্তেজনা প্রশমন করতে থাকেন এবং তাদেরকে বোঝাতে থাকেন। অবশেষে তারা বিরত হয়। এরপর মহানবী (সা.) নিজ পশুর উপর চড়ে সেখান থেকে চলে যান এবং হযরত সা'দ বিন ওবাদার কাছে আসেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে সা'দ! আজ আবু হুবাব আমাকে যা বলেছে তুমি কি তা শুন নি? তিনি (সা.) এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর কথা বলছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমাকে এই এই কথা বলেছে এবং তাকে বিস্তারিত খুলে বলেন। হযরত সা'দ বিন ওবাদা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তাকে উপেক্ষা করুন। সেই সত্তার কসম যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এখন সেই সত্যকে এখানে নিয়ে এসেছেন যা তিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এ জনপদবাসীরা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে তার মাথায় পাগড়ী বাঁধার সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্যের কারণে, যা তিনি আপনাকে দান করেছেন, এটি যেহেতু অনুমোদন করেন নি তাই সে হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে। এজন্য সে ঐসব কথা বলেছে যা আপনি দেখেছেন। এটি শুনে মহানবী (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিক

ও আহলে কিতাবদের মার্জনা করতেন যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا (সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

অর্থাৎ আর তোমরা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে। সেইসাথে আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم (সূরা বাকারা: ১১০)

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা! তোমাদের ঈমান আনয়নের পর আরেকবার তোমাদেরকে কাফের বানাতে চায়, সেই বিদ্বেষের কারণে যা তাদের নিজেদেরই অন্তর থেকে উদ্ভূত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় আদেশ অবতীর্ণ না করা পর্যন্ত তুমি তাদেরকে মার্জনা কর এবং তাদের (দোষত্রুটি) উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতাবান। আর মহানবী (সা.) ক্ষমা করাকেই যথোপযুক্ত মনে করতেন যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন বদরের প্রান্তরে তাদের মোকাবেলা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা এই লড়াইয়ে কাফের কুরাইশদের বড় বড় নেতাকে ধ্বংস করেন তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল এবং তার মুশরেক ও মূর্তি পূজারী সাথীরা বলা আরম্ভ করে যে, এখন তো এই জামা'ত মহিমাদীপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা মহানবী (সা.)-এর হাতে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে বয়আত করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। তাদের ইসলাম গ্রহণও এমনই ছিল, যখন দেখে যে, (মুসলমানরা) বদরের যুদ্ধে সফল হয়েছে তখন তারা ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

যাহোক এসব রেওয়ায়েত, যেমনটি আমি বলেছি, এগুলোর সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও আমি বর্ণনা করি যেন এসব ঘটনাবলী দ্বারা ইতিহাসও জানা হয়ে যায়। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের চরিত্রের স্বরূপও হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) মুসলমানদের সমবেত করে তাদের কাছে কুরাইশদের এই আক্রমণের ব্যাপারে পরামর্শ চান যে, মদিনায় অবস্থান করা উচিত নাকি মদিনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। এই পরামর্শ সভায় আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও উপস্থিত ছিল, যে আসলে মুনাফেক ছিল কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর সে বাহ্যত মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এটি প্রথম কোন উপলক্ষ্য যখন মহানবী (সা.) তাকে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরামর্শ করার পূর্বে মহানবী (সা.) কুরাইশদের আক্রমণ এবং তাদের রক্তক্ষয়ী সংকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে একটি গাভী দেখেছি, সেইসাথে আরো দেখেছি যে, আমার তরবারির অগ্রভাগ ভেঙে গেছে। এরপর আমি দেখি, সেই গাভীটি জবাই করা হচ্ছে। আরো দেখি যে, আমি আমার হাত একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত বর্মের ভিতর প্রবিষ্ট করি। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) বলেন, স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি দুম্বার পিঠে আরোহিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, গাভী জবাই হওয়ার অর্থ আমি মনে করি আমার কতক সাহাবী শহীদ হওয়া। আর আমার তরবারির প্রান্ত ভেঙে যাওয়ার মাধ্যমে আমার প্রিয়দের কারো শহীদ হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত বলে মনে হয় অথবা

হয়ত এই অভিজানে আমার নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে। আর বর্মের ভিতর হাত রাখার অর্থ আমি এটি মনে করি যে, এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের মদিনায় অবস্থান করা অধিক যুক্তযুক্ত। আর দুম্বায় আরোহনমূলকে স্বপ্নের তিনি (সা.) এই ব্যাখ্যা করেন যে, এর মাধ্যমে কাফের সৈন্যবাহিনীর সরদার অর্থাৎ পতাকাবাহীকে বোঝানো হয়েছে যে ইনশাআল্লাহ্ মুসলমানদের হাতে নিহত হবে।

এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান যে, এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। কতিপয় প্রবীণ সাহাবী পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে এবং ভেবে-চিন্তে আর হয়ত কিছুটা মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নে প্রভাবিত হয়ে এই মতামত দেন যে, মদিনায় অবস্থান করে মোকাবিলা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও একই মতামত দেয় আর মহানবী (সা.)ও এই মতই পছন্দ করেন এবং বলেন, এটিই উত্তম হবে বলে মনে হয়, অর্থাৎ মদিনার ভেতর থেকে শত্রুকে প্রতিহত করা। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী আর বিশষভাবে সেসব যুবক, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং নিজেদের শাহাদতের মাধ্যমে ধর্মসেবার সুযোগ লাভ করতে চাচ্ছিল এবং এর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছিল, জোর দিয়ে নিবেদন করে যে, শহর থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠে মোকাবিলা করা উচিত। তারা এত বেশি জোর দেয় এবং নিজেদের মতামত উপস্থাপন করে যে, মহানবী (সা.) তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তাদের কথা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, আমরা উন্মুক্ত মাঠে বের হয়ে কাফেরদের মোকাবিলা করব। জুমুআর নামাযের পর তিনি (সা.) মুসলমানদের মাঝে সাধারন তাহরীক করেন যে, তারা যেন আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুণ্যের ভাগী হয়। এরপর তিনি ঘরের ভেতর চলে যান, যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) এর সাহায্যে পাগড়ী বাঁধেন ও যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন আর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র নাম নিয়ে বাহিরে বের হন। কিন্তু এরই মধ্যে অওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং অন্যান্য প্রবীণ সাহাবীদের বুঝানোর কারণে যুবকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর মতের বিপরীতে নিজেদের মতামতের উপর জোর দেয়া উচিত নয় এবং তাদের অধিকাংশই অনুতপ্ত ছিল।

তারা যখন মহানবী (সা.)-কে অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং দু'স্তর বিশিষ্ট বর্ম ও শিরস্ত্রান প্রভৃতি পরিধান করা অবস্থায় বাহিরে আসতে দেখে তখন তাদের অনুশোচনা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা আরো অস্থির হয়ে যায়। আর তারা প্রায় সমস্বরে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে যে, আমরা আপনার মতের বিপরীতে নিজেদের মতের ওপর জোর দিয়েছি। আপনি যা সঠিক মনে করেন তা-ই করুন, ইনশাআল্লাহ্, এতেই বরকত হবে। তিনি (সা.) অত্যন্ত দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, এটি খোদার নবীর মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি সশস্ত্র হওয়ার পর পুনরায় তা খুলে ফেলবেন, যতক্ষণ খোদা কোন সিদ্ধান্ত না দেন। এখন আর এটি হতে পারে না। অর্থাৎ এটি খোদার নবীর জন্য সাজে না যে, তিনি অস্ত্রসজ্জিত হবার পর পুনরায় তা খুলে ফেলবেন, তবে এটি আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত হলে ভিন্ন কথা। অতএব এখন আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তোমাদের সাথে থাকবে। এরপর মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর জন্য তিনটি পতাকা তৈরী করান। 'অউস' গোত্রের পতাকা উসায়েদ বিন হুযায়ের এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। 'খাযরাজ' গোত্রের পতাকা

হুবাব বিন মুনযের এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। আর মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলীকে প্রদান করা হয়। আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম-কে মদিনায় নামাযের ইমাম নিযুক্ত করে আসরের নামাযের পর মহানবী (সা.) সাহাবীদের এক বড় জামা'তকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। 'অউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রের সর্দার সা'দ বিন মুআয ও সা'দ বিন উবাদা তাঁর (সা.) বাহনের সামনে ধীরে ধীরে দৌড়াচ্ছিলেন এবং অন্য সাহাবীরা তাঁর (সা.) ডানে, বামে এবং পিছনে চলছিলেন। উহুদ পাহাড় মদিনার উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর মদিনার নিকটবর্তী 'শায়খাইন' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি (সা.) যাত্রাবিরতি দেন এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনীর অবস্থা যাচাইয়ের নির্দেশ প্রদান করেন। স্বল্প বয়স্ক শিশু যারা জিহাদের আগ্রহে সাথে চলে এসেছিল, তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। অতএব আব্দুল্লাহ বিন উমর, উসামা বিন যায়েদ, আবু সাঈদ খুদরী প্রমুখ সবাইকে ফেরত পাঠানো হয়। রাফে বিন খাদিজ সেই শিশুদেরই সমবয়সী ছিলেন, কিন্তু তিরন্দাজিতে পারদর্শী ছিলেন। তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তার পিতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে তাকে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করেন। মহানবী (সা.) রাফে'র দিকে তাকালে, তিনি সৈনিকদের মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যান যাতে তাকে চৌকশ ও লম্বা দেখায়। অতএব তার এই কৌশল কাজে আসে আর মহানবী (সা.) তাকেও সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। তখন আরেক বালক সামুরা বিন জুনদুব যিনি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছিলেন, তিনি তার পিতার কাছে যান এবং বলেন, যদি রাফে-কে নেয়া হয় তাহলে আমারও অনুমতি পাওয়া উচিত কেননা, আমি রাফে-র চেয়ে শক্ত-সমর্থ আর মল্লযুদ্ধে তাকে ধরাশায়ী করি। ছেলের এরূপ নিষ্ঠা দেখে পিতা খুবই আনন্দিত হন এবং তাকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং নিজ পুত্রের মনোবাসনার কথা ব্যক্ত করেন। মহানবী (সা.) মুচকি হেসে বলেন, ঠিক আছে, বিষয় যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে রাফে এবং সামুরার মধ্যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করি যাতে বুঝা যায় যে, কে বেশি শক্ত-সমর্থ। অতএব মোকাবিলা হয় আর সত্যিই অল্প সময়ের মধ্যেই সামুরা রাফে'কে তুলে আছাড় মারেন। এতে মহানবী (সা.) সামুরাকেও সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন আর সেই নিষ্পাপ বালকের মন আনন্দে ভরে যায়। তখন যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই বেলাল (রা.) আযান দেন আর সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করেন। এরপর সেই রাতের জন্য সাহাবীরা সেখানেই তাঁবু খাটান এবং মহানবী (সা.) নৈশ প্রহরার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলেমা (রা.)-কে ব্যবস্থাপক বা নেতা নিযুক্ত করেন, যিনি পঞ্চাশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সারা রাত মুসলিম সৈন্যবাহীনির চতুষ্পার্শ্বে টহল দেন।

পরের দিন ৩রা হিজরীর ১৫ই শাওয়াল মোতাবেক ৩১শে মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার সেহরীর সময় এই মুসলিম সৈন্যবাহীনি সম্মুখে অগ্রসর হয় আর পথিমধ্যে নামায আদায় করে সকাল হতেই উহুদ প্রান্তরে পৌঁছে যায়। তখন মুনাফিক-সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিজের তিনশ' সঙ্গীসহ মুসলমানদের সৈন্যবাহীনি থেকে পৃথক হয়ে একথা বলে মদিনা অভিমুখে ফিরে যায় যে, মুহাম্মদ (সা.) আমার কথা মানেন নি এবং অনভিজ্ঞ যুবকদের কথায় (মদিনার) বাহিরে বের হয়ে এসেছেন, তাই আমি তাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতে পারব না। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাকে বুঝায় যে, এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়, কিন্তু সে কারো কথায় কর্ণপাত করে নি বরং একথাই বলতে থাকে যে, এটি কোন যুদ্ধ হলো! যদি যুদ্ধ হতো তাহলে আমি যোগ দিতাম,

কিন্তু এটি কোন যুদ্ধই নয় বরং নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। এখন মুসলমানদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল কেবল সাতশ, যা কাফিরদের তিনহাজার সৈন্যের মোকাবিলায় এক চতুর্থাংশেরও কম ছিল। যাহোক, যুদ্ধ হয়। এ সংক্রান্ত আরো কিছু বৃত্যান্ত রয়েছে, বাদবাকী ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে খুতবায় বর্ণনা করব।

এখন আমি একজন মরহুমেরও স্মৃতিচারণ করতে চাই, নামাযের পর যার গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তিনি হলেন, মরহুম মওলানা কমর উদ্দীন সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় খাজা রশীদ উদ্দীন কমর সাহেব। কিছুদিন রোগভোগের পর গত ১০ই অক্টোবর ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯৩৩ সনে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর আমি যেমনটি বলেছি, তিনি মৌলভী কমর উদ্দীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মৌলভী কমর উদ্দীন সাহেবকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম সদর নিযুক্ত করেছিলেন। মরহুম হযরত মিয়া খায়ের উদ্দীন সীখওয়ানী সাহেব (রা.)-এর পৌত্র আর আমাদের যুক্তরাজ্যের শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেবের মামা ছিলেন। হযরত মিয়া খায়ের উদ্দীন সীখওয়ানী এবং তার (অপর) দু'ভাই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'আঞ্জামে আথম' পুস্তকে লিখেছেন যে, আমি আমার জামা'তের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হই যে, তাদের মাঝে অত্যন্ত স্বল্প আয়ের লোক যেমন মিয়া জামালুদ্দিন ও খায়রুদ্দিন এবং ইমামুদ্দিন কাশ্মীরি প্রমুখ আমার গ্রামের পাশেই বসবাস করেন। তারা তিনজন দরিদ্র ভাই হয়ত মজদুরী করে দৈনিক তিন আনা বা চার আনা আয় করেন, কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মাসিক চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর অপর এক উপলক্ষ্যে যখন তিনি (আ.) চাঁদার তাহরীক করেন তখন তারা তিন ভাই-ই তাতে চাঁদা প্রদান করেন। তাদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদের চাঁদা প্রদানের বিষয়টি বড়ই অদ্ভুত এবং ঈর্ষণীয়। জাগতিক ধনসম্পদের মোহ তাদের মাঝে নেই বললেই চলে, যেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর ন্যায় যা-ই ঘরে ছিল তার সবই নিয়ে এসেছেন এবং ধর্মকে জগতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন যেমনটি বয়আতের শর্ত ছিল। হযরত খাজা সাহেব তাদেরই বংশধর ছিলেন। মরহুম পাকিস্তানে হিজরতের পর কিছুকাল পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কাজ করেন। এরপর ১৯৫৮ সনে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হন এবং এখানে ৩৩ বছর পর্যন্ত বৃটিশ বিমানবাহিনীতে চকরিরত ছিলেন। তার যেহেতু ধর্মসেবারও আগ্রহ ছিল তাই চাকরিকালেও তিনি তার ডিউটি রাতের বেলায় রাখতেন যেন দিনের বেলায় ধর্মসেবা করতে পারেন। তিনি প্রায় সারাজীবন ধর্মসেবায় অতিবাহিত করেছেন। জামা'তের বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। যুক্তরাজ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কায়েদ হিসেবে সাত বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তখন সারা বিশ্বের খোদ্দামুল আহমদীয়া কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে ছিল। যাহোক তিনি যুক্তরাজ্যের প্রথম কায়েদ ছিলেন। একই সাথে তিনি ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী রিশতানাতা, সেক্রেটারী উমুরে আমা, নায়েব অফিসার জলসাগাহ্ হিসেবেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

খাজা সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা ছিল। জামা'তের বুযুর্গ, মুরব্বী এবং কর্মকর্তাদের অনেক সম্মান করতেন। অত্যন্ত পুণ্যবান ও তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন। নিয়মিত বাজামা'ত নামায আদায়কারী, চাঁদা এবং সদকা ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মিত, অতি মিশুক, দরিদ্রদের দেখাশোনাকারী, শিশুদের সাথে অত্যন্ত নম্রতাপূর্ণ আচরণ করতেন, বড় এবং ছোটদেরও সম্মান করতেন, খুবই দোয়াগো বুযুর্গ

ছিলেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়া এক পুত্র এবং দুই কন্যা, এক বোন এবং তিন ভাই রেখে গেছেন। তার দৌহিত্র কাসেদ মুঈন সাহেব জামা'তের মুরব্বী, যিনি আজকাল এমটিএ এবং আলহাকাম-এ কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। কাসেদ মুঈন সাহেব বলেন, আমরা শনি ও রবিবার আমাদের নানাবাড়িতে কাটাতাম এবং সেখানে থাকতাম। প্রতি সপ্তাহে তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি শৈশবে অধিকাংশ সময় তার ঘরেই ঘুমাতাম। তাকে সবসময় দেখেছি যে, ঘুমানোর পূর্বে তিনি নফল পড়ে শুতেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে, ধীরেসুস্থে এবং প্রশান্তচিত্তে নফল পড়তেন আর ভোরে নিয়মিত তাজাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং ফজরের জন্য আমাদেরও জাগাতেন। তিনি লিখেন, তাকে সর্বদা অত্যন্ত কোমল-হৃদয় পেয়েছি, খুবই ফিরিশতা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কখনো আমাদের বকাঝকা করেন নি। একবার আমাকে বকেছেন বলে আমার স্মরণ আছে, আর তার কারণ হলো, আমি খলীফা রাবে (রাহে.)-র যুগে শৈশবের নিষ্পাপ চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করি যে, পরবর্তী খলীফা কে হবেন? অর্থাৎ পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এতে নানাজান আমাকে খুবই বকাঝকা করেন এবং বোঝান যে, এমন কথা বলতে হয় না। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশু বয়সেই আমি খিলাফতের মর্যাদা বুঝতে পারি।

যাহোক খিলাফতের সাথে তার অসাধারণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি নিয়মিত আমাকেও পত্র লিখতেন। অসুস্থতা নিয়ে শেষ দিনগুলোতেও দেখা করতে আসেন। এখানে আমার সফরের জন্য আসার কয়েক দিন পূর্বে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তার ক্যানসার ধরা পড়েছিল। অসুস্থতা ও চিকিৎসা ছিল বড় কষ্টদায়ক, কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে রোগের মোকাবিলা করেন আর খুবই সাহসিকতার সাথে সমস্ত কথা আমাকে বলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন আর নিজ প্রিয়দের মাঝে ঠাঁই দিন। তার সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও তার পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)